পোতাজিয়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের
সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

অনন্ত কুমার গোস্বামী

পোতাজিয়া দ্বি-পার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয়ের ১৩০তম বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা উৎসব উদযাপন উপলক্ষে প্রকাশিত সংকলনটি এই বিদ্যালয়ের ঐতিহ্য জ্ঞাপন বহুবিধ বিষয় সংযোজিত হইয়াছে।

সংযোজিত বিষয়গুলিতে পাঠকদের অত্র বিদ্যালয়টির একটি পূর্ণাঙ্গ সংকলন প্রয়োজন। এই সংকলনটিতে অত্র বিদ্যালয়ের একটি ভাবগম্ভীর বিশ্লেষণ বোধগম্য হইতে কষ্টসাধ্য হইবে বিধায়, অত্র প্রবন্ধটিতে বিদ্যালয়টির জন্মলগ্ন হইতে বর্তমান অবস্থা পর্যন্ত একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লিপিবদ্ধ করার প্রচেষ্টা গ্রহণ করা হইল। এই প্রচেষ্টা কতটুকু সার্থক হইল তাহার মূল্যায়ন পাঠকদের হৃদয়ে।

পোতাজিয়া দ্বি-পার্শ্বিক উচ্চ-বিদ্যালয়ের একটি ইতিহাস রচনা করিতে পোতাজিয়া গ্রামটি সম্পর্কে পাঠকদের ধারনা থাকা একান্তভাবে প্রয়োজন। পোতাজিয়া বৃহত্তর পাবনা জেলার-[বর্তমানে সিরাজগঞ্জ] অন্তর্গত শাহজাদপুর থানার একটি গ্রাম, যাহা শাজাদপুরের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে চলন বিলের হাওর এলাকায় অবস্থিত। এই গ্রামটির পোতাজিয়া নামকরণের পিছনে রহিয়াছে একটি উজ্জ্বল ইতিহাস। ইসলাম প্রচারের জন্য যে কয়েকজন আওলিয়া দরবেশ এই উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে গমন করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে 'ইয়ামেন' দেশের বাদশাহর পুত্র মুখদম্ শাহদ্দৌলা (রহঃ) আসিয়াছিলেন জলপথে তৎকালীন জাহাজ বা পোত্ যোগে। এই মনীষীর পোৎ জলের গভীরতা কম থাকায় এই স্থানটিতে আওজান বা নঙ্গর ফেলেন। তিনি ইসলাম প্রচার করিতে শহীদ হইয়াছিলেন শাহজাদপুরে। যাঁহার মাজার আজ পর্যন্তও শাজাদপুরে সুমহান মর্যাদার সহিত সমুজ্জ্বল রহিয়াছে শাহজাদপুরের করতোয়া নদীর তীরে। এখানে উল্লেখ্য যে, অতীতে করতোয়া নদী চলন বিলের মধ্যেই সংযুক্ত ছিল। তাঁহার জাহাজ নঙ্গর করিয়াছিলেন বলিয়া এই স্থানটির নামকরণ করিয়াছিলেন পোত অর্থ জাহাজ, আওজিয়া অর্থ নঙ্গর করা অর্থাৎ পোতাজিয়া। পরবর্তীতে ধর্ম

প্রচারের জন্য তিনি তাঁহার একজন সফর সঙ্গী হযরত খোয়াজ মনসুর ইয়ামেনী (রহঃ)-কে দায়িত্ব দেন। হযরত খোয়াজ মনসুর ইয়ামেনী (রহঃ) ইসলাম ধর্ম প্রচার কাজে ব্যস্ত থাকিয়া পোতাজিয়াতেই ইন্তেকাল করেন। তাঁহার মাজার শরীফও এইখানেই অবস্থিত। যে স্থানটি বর্তমানে পীরতলা নামে পরিচিত। পাবনা জেলার ইতিহাস ইহার স্বাক্ষর বহন করিতেছে। পরবর্তীকালে মুসলিম শাসনের অবসান হইয়া বৃটিশ শাসন কায়েম হয়। বৃটিশ শাসনের সময়ও এই গ্রামটি একটি ঐতিহ্যমণ্ডিত গ্রাম হিসাবেই সুপরিচিত ছিল। যে কারণে বৃটিশ শাসনের কুখ্যাত নীলকুঠি স্থাপনের সে নিদর্শনেরও সাক্ষ্য দেখা যায় এই পোতাজিয়ার পশ্চিমাঞ্চলে পাথারের মধ্যে শিরিষবৃক্ষে সুসজ্জিত একটি উচুস্থান যাহা অদ্যাবধি কুঠিবাড়ী নামে পরিচিত। এই গ্রামে সপ্তদশ শতাব্দির ঐতিহাসিক একটি স্থাপত্য কর্মও রহিয়াছে যাহার নাম নবরত্ন মন্দির।

অষ্টদশ শতাব্দিতে এই গ্রামে বসবাস করিত জমিদার, উচ্চ মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত, শ্রমজীবি এবং কৃষিজীবি শ্রেণীর লোক গ্রামসহ এলাকার কিছু অংশ বিশ্ব কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের জমিদারীর অন্তর্ভূক্ত ছিল। অন্যান্য জমিদার যেমন শ্রীশ চন্দ্র রায়, হরিশ রায় প্রমুখ ব্যক্তিদের নাম উল্লেখযোগ্য। দেশীয় সাংস্কৃতিক চর্চ্চায় পোতাজিয়া গ্রামটি একটি দৃষ্টান্ত স্বরূপ। এই গ্রামে হিন্দু-মুসলমান যে নিবির ভাতৃসুলভ বন্ধনে থাকিয়া বসবাস করিত তাহার দৃষ্টান্ত এই গ্রামের ঈদ উৎসব, দূর্গা উৎসব ইত্যাদি প্রতিপালন, যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি প্রতিফলিত হইয়াছিল অতীতে, বর্তমানেও তাহার সাক্ষ্য দেখিতে পাওয়া যায় উক্ত উৎসবগুলিতে।

ভারতে যখন ইংরেজী শিক্ষা বা ইংরেজ কর্তৃক আরোপিত শিক্ষাব্যবস্থা এ দেশের মানুষ গ্রহণ করার সুযোগ পায়, স্থানে স্থানে ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় স্থাপিত হয়, বিভিন্ন প্রচেষ্টায় পোতাজিয়ার তৎকালীন বুদ্ধিজীবিগণ সেই শিক্ষায় শিক্ষিত হওয়ার পরিমন্ডলের পিছনে পড়িয়া যান নাই। সেই স্রোতধারাতেই প্রতিষ্ঠিত এই পোতাজিয়া উচ্চ বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপটটি এই গ্রাম ও ইহার পার্শ্ববর্তী বিশেষ করিয়া রাউতারা গ্রামের শিক্ষানুরাগের এটি মহান দৃষ্টান্ত।

সেই প্রসঙ্গে অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা লাভ হওয়াটা একটি বিচিত্রধর্মী। ব্রিটিশ আমলে এই দেশে জমিদার এককভাবে অথবা কোন উচ্চবিত্তশালী ব্যক্তি এককভাবে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার বহু দৃষ্টান্ত থাকিলেও পোতাজিয়া গ্রামের অত্র বিদ্যালয়টি একক অনুদানের ভিত্তি ছিল না। এখানে এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন এই গ্রামের সর্বশ্রেণীর বুদ্ধিজীবি মহল। এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার উদ্যোগের দায়িত্ব গ্রহণ করেন অত্র গ্রামের একটি পরিবারের তিন ভাই :

১. কুমুনেন্দু রায় [অবঃ দায়রাজজ]

২. অম্বিকা নাথ রায়

৩. তারানাথ রায়

এই ভাতৃত্রয় পোতাজিয়ার সর্বস্তরের জনগনকে সংগঠিত করিয়া বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার কর্মসূচী গ্রহণ করেন। এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার জন্য সর্বাধিক অবদান ও কর্মপ্রচেষ্টার স্বাক্ষর রাখেন অম্বিকা নাথ রায়। তিনি দ্বারে দ্বারে এবং দেশ-বিদেশ হইতে ভিক্ষালব্দ অর্থ সংগ্রহ করিয়া এই প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠায় ব্রতী হন। তিনি তাঁহার গৃহীত প্রত্যেক পদক্ষেপ জনসাধারণের নিকট জ্ঞাত করিয়াছিলেন।

প্রথম বিদ্যালয়টির স্থান নির্দিষ্ট করা হয় পোতাজিয়া গ্রামের কেন্দ্র বিন্দুতে। এই গ্রামটি আঠারটি পাড়া সম্বলিত বৃহৎ গ্রাম। প্রতিটি পাড়ার সহিত সমান নৈকট্য স্থলপথে ও জলপথে যুক্ত ছিল। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন পোতাজিয়া গ্রামটির প্রত্যেক পাড়ায় যাতায়াতের জন্য জলপথের গুরুত্বই বেশী ছিল, বর্তমানেও যাহা বিদ্যমান রহিয়াছে। প্রথম নির্দিষ্ট স্থানটি কবি গুরু রবিন্দ্রনাথ ঠাকুরদের স্টেট হইতে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার জন্য বন্দোবস্ত লয়েন এবং প্রাথমিক পর্যায়ে ইংরেজী ১৮৮৮ সালে একটি এম. ই. স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়া এই বিদ্যাপিট স্থাপনের প্রচেষ্টার সার্থকতা লাভ করে। তৎপরবর্তীকালে শ্রী অম্বিকা নাথ রায়ের নিরলস প্রচেষ্টায় পূর্নাঙ্গ উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়ে উন্নীত হয় এবং পরবর্তীতে এই বিদ্যালয়টি ইংরেজী ১৮৯৪ সালের ১২ই মার্চ তারিখে বৃহত্তর পাবনা জেলার ৫ম তম বিদ্যালয় হিসাবে কলিকাতা হইতে পোতাজিয়া ইংরেজী উচ্চ বিদ্যালয় নামে অনুমোদন লাভ করে। এই সূত্রে উক্ত তারিখটি অত্র বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার দিন বলিয়া ধরা হয় এবং সর্বসম্মতভাবে বিদ্যালয়টির প্রতিষ্ঠাতা হিসাবে ও প্রথম সম্পাদক হিসাবে অম্বিকানাথ রায়-এর নাম চিরস্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে এবং থাকিবে। এখানে এই বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠায় যাঁহারা অম্বিকাবাবুকে নানাভাবে উৎসাহিত এবং পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান করিয়াছিলেন তাঁহাদের প্রথম সারির নাম উল্লেখ করা একান্ত আবশ্যক। তাঁহাদের কতিপয় নাম এখানে উল্লেখিত হইল :

(১) স্থানীয় জমিদার বাবু শ্রীশ চন্দ্র রায়

(২) স্থানীয় জোদ্দার বাবু গৌরলাল ঘোষ

(৩) রাউতারার জমিদার বাবু সুরথলাল চৌধুরী

(৪) রাউতারার জমিদার বাবু রশিকলাল নন্দী,

(৫) মোহাম্মদ মোসলেম পণ্ডিত (স্থানীয় সমাজসেবী)

আরও অনেক বিদ্যানুরাগী ব্যক্তি এই বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠায় বিভিন্নভাবে অম্বিকা বাবুকে সহযোগীতা প্রদান করিয়াছেন। তাঁহাদের কাছেও বর্তমান প্রজন্ম আজীবন ঋণী। উচ্চ বিদ্যালয় হিসাবে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিদ্যালয়টি সগৌরবে বিদ্যাদান করিতে থাকে এবং বহু প্রথিত জশা ব্যক্তি এই বিদ্যালয় হইতে অধ্যায়ন অন্তে বিদ্যার সুউচ্চস্থানে কৃতিত্বের সহিত তাহাদিগকে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। প্রথম হইতেই কো-এডুকেশন চালু হয় কিন্তু তৎকালে ছাত্রীর সংখ্যা খুবই নগন্য ছিল। বিদ্যালয়ের কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের আজ শতাব্দির প্রান্তে দাঁড়াইয়া প্রত্যেকের নাম উল্লেখ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু দুইজন ছাত্রের কথা উল্লেখযোগ্য যাহাদের নাম শ্রীমন্ত শীল ও শ্রীশ চন্দ্র শীল ভাতৃদ্বয় তাহারা তৎকালীন মেধাভিত্তিক রায়মপ্রেমচাঁদ বৃত্তিলাভ করিয়াছিলেন। প্রথম প্রধান শিক্ষক হিসাবে দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছিলেন বাবু বিহারীলাল গোস্বামী (বিদ্যারত্ন)। তিনি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের একজন নিকটতম বন্ধুস্থানীয় ব্যক্তি ছিলেন। কবিগুরু তাঁহাকে সুকবি বলিয়া অভিহিত করিয়াছিলেন। তাঁহাদের উভয়ের মধ্যে কবিতার ছন্দে পত্র বিনিময় হইত রবীন্দ্রনাথের একজন প্রিয়পাত্র প্রধান শিক্ষক ছিলেন বলিয়াই অত্র বিদ্যালয়ে এই বিশ্বকবির চরণ স্পর্শে অধিকতর মহিমান্বিত হইয়া আছে। প্রধান শিক্ষক হিসাবে বিহারীবাবু ছিলেন বহুগুনের অধিকারী ব্যক্তি। একজন সর্বগুণেগুণান্বিত শিক্ষক, দক্ষ প্রশাসক, গুণী সাহিত্যিক ও কবি এবং একজন ক্রীড়াবিদ। যাহার সাক্ষ্য হিসাবে বিহারীলাল মেমোরিয়াল নামে বৃহৎ কাঠের উপর রৌপ্যখচিত একটি শীল্ড এখনও বিদ্যালয়ের আন্তঃশ্রেণী লীগ খেলায় বিদ্যালয়ে সগৌরবে ব্যবহার বিদ্যমান রহিয়াছে। জীবন যাত্রা ছিল তাঁহার অত্যন্ত সাধারণ কিন্তু তিনি অসাধারণ দক্ষতার সাক্ষ্য বিদ্যালয়ের শ্রীবৃদ্ধি করিয়া অমর হইয়া রহিয়াছেন। পুরাতন বিদ্যালয়ের বিজ্ঞানাগার হিসাবে একটি পৃথক ঘরে প্রয়োজনীয় পদার্থবিদ্যা, রসায়নবিদ্যা, উদ্ভিদবিদ্যা শিক্ষার উপকরণাদির প্রাচুর্য হইতে বুঝিতে পারা যায়। অত্র বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার সকল শ্রেণীর পুস্তকে ছিল সমৃদ্ধ, যাহার মধ্যে এন-সাইক্লোপেডিয়া বৃটনিকা ১২ খন্ড এবং ইন্টারন্যাশন্যাল লাইব্রেরি অফ ফেমাস লিটারেচার ২৪ পর্যন্ত অদ্যাবধি রহিয়াছে। বর্তমানেও অত্র বিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে পুস্তক উল্লেখযোগ্য সংগ্রহের পরিমাণ তাহার মধ্যে পুরাতন পুস্তকের সংখ্যা কম নয়। তাছাড়া বিভিন্ন বিষয় পাঠের জন্য ম্যাপ, গ্লোব, একটি টেলুরিয়াম এবং চিত্র পুরাতনের সহিত বর্তমান যুক্ত হইয়া পাঠ্য বিষয়ের উপকরণে অত্র বিদ্যালয়টি কোন বিদ্যালয়েরই পশ্চাতে নয়।

পুরাতন বিদ্যালয়টির সমস্ত শ্রেণীকক্ষ ছিল টিনের ঘর, টিনের বেড়া। ছেলেমেয়েদের বসিবার জন্য ছিল- বেঞ্চ আর শিক্ষকগণের বসিবার জায়গা ও লাইব্রেরি হিসাবে নির্মিত হইয়াছিল একটি সুদৃশ্য দালান। প্রধান শিক্ষক বিহারী বাবুর বিদায়ের পর অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের ভারগ্রহণ করেন সময় যিনি ছিলেন সহকারী প্রধান শিক্ষক, তাঁহার নাম সুরেন্দ্রনাথ কুণ্ডু। তিনিও একজন বিচক্ষণ এবং সুদক্ষ শিক্ষক ছিলেন। তিনি তাঁহার সময়কাল পর্যন্ত অত্র বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান সমুন্নত রাখিয়া চাকুরীর মেয়াদকাল উত্তীর্ণ হইলে অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার সময়ে অত্র বিদ্যালয়ে জাঁকজমক পূর্ণভাবে পালিত হয় সুবর্ণ জয়ন্তী ১৯৪৪ ইং সালে। তিনি অবসর গ্রহণ করিলে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক হিসাবে কার্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন অতুল্য চন্দ্র চক্রবর্তী।

সুবর্ণ জয়ন্তী উৎসবের কাল হইতেই বিদ্যালয়টি যেহেতু গ্রামের মধ্যে অবস্থিত ছিল কাজেই বাহির হইতে যাতায়াতের বিশেষ অসুবিধা থাকায় পোতাজিয়া ইউনিয়নের অন্যান্য গ্রাম হইতে ছাত্র-ছাত্রীদের যাতায়াতের অসুবিধার জন্য বিদ্যালয়টির ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা কমিতে থাকে। বিদ্যালয়টির যাতায়াত ব্যবস্থা সুবিধার জন্য [illegible] তৎকালীন বিদ্যালয় কমিটি এবং বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ [illegible] বিদ্যালয়টি গ্রামের পূর্বপ্রান্তে তৎকালিন সিরাজগঞ্জ-পাব[illegible] রোডের প্রধান সড়ক সংলগ্ন স্থানে স্থানান্তরের চিন্তাভা[illegible] করেন। বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠার সময়ই বিদ্যালয়ের ছাত্র[illegible] খেলিবার মাঠ ছিল বিদ্যালয়ের কাছাকাছি সমতল গোচারণভূমির পার্শ্বে। সে জন্য স্থানান্তরের পর বিদ্যালয় নির্ধারিত স্থান হইতে খেলিবার মাঠের দূরত্ব অনেকটা বেশী হয়। এই ব্যাপারে সুধীমণ্ডলীর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লইতে কিছুটা বিলম্ব হয়। বৃটিশের বিরুদ্ধে স্বদেশী আন্দোলন তখন চরমপর্যায়ে। বিদ্যালয়টি স্থানান্তরের পরিকল্পনা চূড়ান্ত হইলেও কার্যতঃ স্থানান্তর ক্রিয়াটি বিলম্বিত হয়। অবশেষে দেশ বিভক্ত হওয়ায় এবং একজন বিশিষ্ট বিদ্যুৎসাহী জোদ্দার রাউতারা নিবাসী যোগেশ চন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের মৃত্যুতে এই স্থানান্তর প্রক্রিয়া বিলম্বিত হয়। তাহাছাড়া, বিদ্যালয়টির ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক কিছুদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গে গমনহেতু 'কার্যটি রূপলাভ করে ১৯৪৮ ইং সালে। তখন প্রধানশিক্ষকের দায়িত্বভার গ্রহন করেন অবৈতনিকভাবে অত্র গ্রাম নিবাসী নিবারণ চন্দ্র ঘোষ বি. এ, বি-এল মহাশয়। ঐ সময় উল্লেখিত যোগেশ চন্দ্র ঘোষের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা গৌরচন্দ্র ঘোষ, পোতাজিয়া ইউনিয়নের তৎকালীন প্রেসি[illegible] নির্মল চন্দ্র চক্রবর্তী, ভাইস প্রেসিডেন্ট আঃ জব্বা[illegible] তালুকদার বিশিষ্ট সমাজসেবী আব্দুল মজিদ (পণ্ডিত, [illegible] গোলাম মওলা প্রমুখ বিদ্যুৎসাহীগণের নিরলস প্রচেষ্টা[illegible] বিদ্যালয়টি বর্তমান স্থানে স্থানান্তরিত হয়। গৌর চন্দ্র [illegible] মহাশয় তাঁহার মৃত ভ্রাতার ইচ্ছা পূরণের জন্য নিজ [illegible] হইতে ৯,০০০ টাকা ব্যয় করিয়া অফিসগৃহ ও শিক্ষক[illegible] বসিবার

দালান নির্মাণ করিয়াছিলেন। যাহা যোগেশ চন্দ্র মেমোরিয়াল হল নামকরণ করা হইয়াছিল। অন্যান্য শ্রেণীকক্ষ টিনের ঘর, উত্তোলন করিয়াই চলিতে থাকে। ঐ সময় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকে দেশ ছাড়ায় বিদ্যালয়টির ছাত্রছাত্রী সংখ্যা আশানুরূপ বৃদ্ধি পায় না। তবে পরবর্তীতে পূর্বের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক শ্রী অতুল্য চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয় দেশে ফেরেন এবং নিবারণ চন্দ্র ঘোষ মহাশয় অসুস্থতার কারণে অবসর গ্রহন করিলে পুনরায় তিনি প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তাঁহার পর প্রধান শিক্ষকের ভার গ্রহণ করেন একজন সুদক্ষ সিরাজগঞ্জ বি. এল. স্কুলের কার্যরত শিক্ষক অত্র গ্রাম নিবাসী হরিপদ অধিকারী মহাশয়। তাহাতে কিছুটা প্রাণের সঞ্চার ঘটে এবং প্রতি বৎসর ম্যাট্রিক পরীক্ষার পাশের হার পূর্বের ন্যায় উন্নিত হয়। হরিপদ বাবু অবসর গ্রহণের পর অত্র বিদ্যালয়ে একজন অভিজ্ঞ শিক্ষক যিনি শাহজাদপুরের ইব্রাহীম বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক দেবেশ চন্দ্র রায় প্রধান শিক্ষক পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন ১৯৫৪ ইং সালে। এখানে উল্লেখ্য যে ইতিমধ্যে অত্র গ্রামে একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপিত হওয়ায় অত্র বিদ্যালয়ের প্রায় সকল ছাত্রীগণই উক্ত বালিকা বিদ্যালয়ে অধ্যায়নের সুযোগ পায় এবং বিদ্যালয় হইতে ছাত্রীদের সংখ্যা হ্রাস পায়। তাছাড়া তাঁহার নিযুক্তিকালে পোতাজিয়া এবং তৎপাশ্ববর্তী অঞ্চলে মাঠের ফসল প্রতি বৎসর বন্যায় নষ্ট হইতে থাকে এবং বড়-ছোট সমস্ত কৃষক পরিবারই আর্থিক বিপর্যয়ে পতিত হয়।

সংগতকারণেই বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা প্রতিবৎসর কমিতে থাকে। দেবেশ চন্দ্র রায় ছিলেন উল্লাপাড়ার নিকট ভট্টকাগ গ্রামের একজন উচ্চ মধ্যবিত্ত শ্রেণীর লোক। তিনি ছিলেন একক, নিঃসন্তান এবং বিপত্নীক। বিদ্যালয়ের অন্যান্য শিক্ষক প্রবীন এবং স্থানীয় সুযোগ্যতা সম্পন্ন ছিলেন বলিয়াই ছাত্র কমিয়া যাওয়ার কারণেও আর্থিক অনটনের বিষয়টি শিক্ষকগণ অনেক ধৈর্য ও ত্যাগ স্বীকার করিয়া বিদ্যালয়টি সমুন্নত রাখেন। ঐ সময় কয়েকজন তরুণ হিন্দু শিক্ষক দেশত্যাগ করায় সেই সমস্ত শূন্যস্থানে বিভিন্ন স্থান হইতে শিক্ষক নিয়োগ করা হয়। কিন্তু বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থার প্রেক্ষাপটে তাঁহারা বেশি দিন অত্র বিদ্যালয়ে বহাল থাকেন নাই। এই অসুবিধাকর অবস্থায় বিদ্যালয়ের পরিচালনা কমিটি এবং গ্রামের সুধীব্যক্তিগণ অত্র এলাকার যোগ্যতাসম্পন্ন শিক্ষক নিয়োগ করিবার নীতি গ্রহন করেন এবং স্থানীয় শিক্ষক নিয়োগের দৃষ্টান্ত সৃষ্টি করেন।

ঐ একই চিন্তাধারায় অত্র বিদ্যালয়ের স্থানীয় এবং অত্র বিদ্যালয়েরই ছাত্র ছালামত আলী বি. এ সাহেবকে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে নিয়োগ করা হয় এবং তিনি অত্র বিদ্যালয়ে চাকুরীরত অবস্থাতেই বি-এড. ডিগ্রী নেন। প্রধান শিক্ষকের চাকুরীর মেয়াদ বর্ধিত করিয়া সরকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন সাপেক্ষে তাঁহাকে চাকুরীতে বহাল রাখেন। ইতিমধ্যে গ্রামে স্থাপিত বালিকা বিদ্যালয়টি অর্থনৈতিক অনটনে ও আরও অন্যান্য কারণে বিলুপ্ত হইয়া যায়। ফলে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা কিঞ্চিৎবৃদ্ধি পায়। তৎসঙ্গে

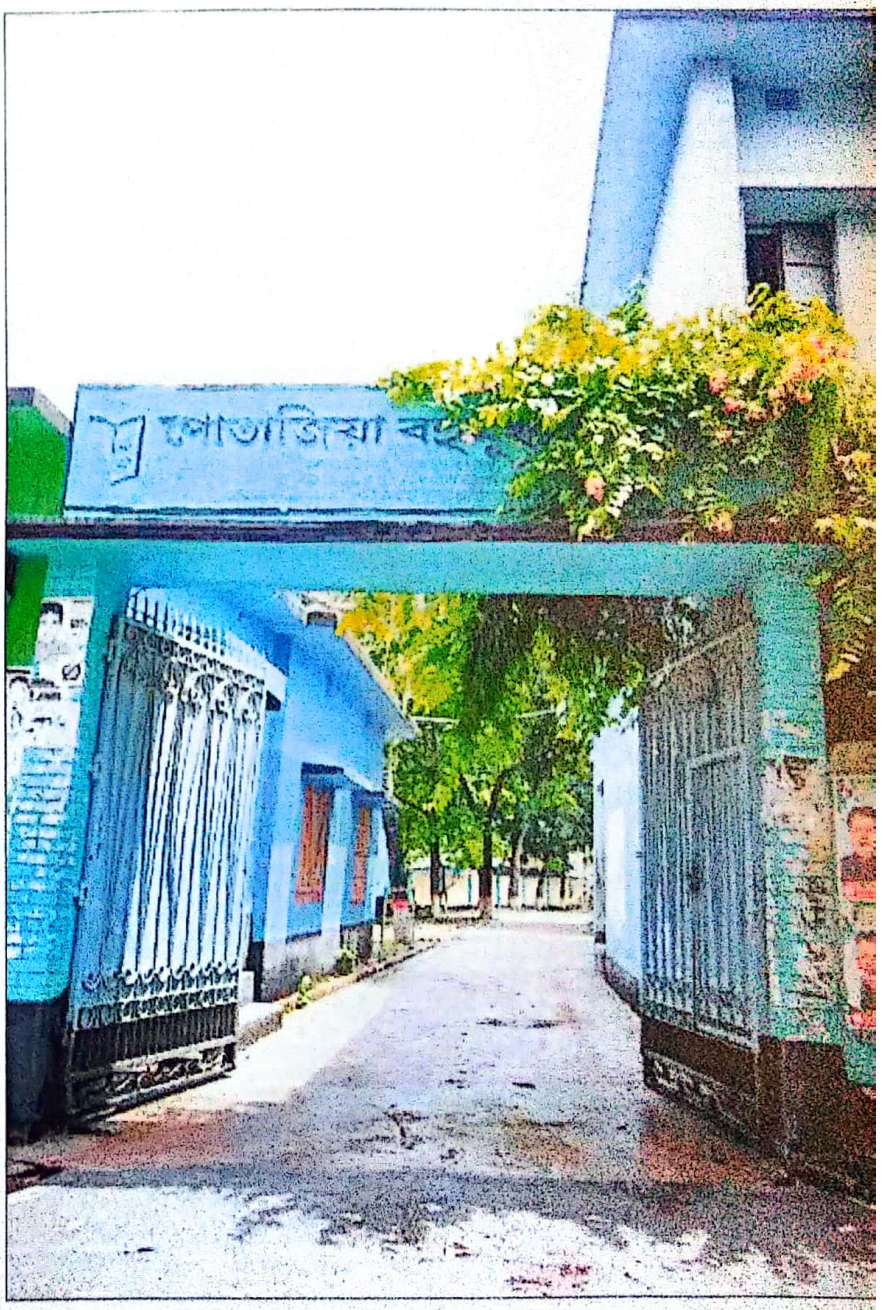

বিদ্যালয়ের আর্থিক অবস্থারও উন্নতি হয়। তাহার পর চাকুরীর বয়সসীমা বর্ধিত সীমার উর্ধ্বে উঠায় দেবেশ চন্দ্র রায় অবসর গ্রহন করেন। বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সহকারী প্রধান

শিক্ষককে প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব অর্পণ করেন। যিনি দীর্ঘ প্রায় ৩০ বৎসর যাবৎ প্রধান শিক্ষকের পদে আসীন আছেন। জনাব ছালামত আলী প্রধান শিক্ষক পদে যোগদানের পর বিজ্ঞান ও মানবিক উভয় বিভাগেই শিক্ষা ব্যবস্থা চালু হয় এবং বিদ্যালয়টি পোতাজিয়া দ্বি-পার্শ্বিক উচ্চ বিদ্যালয় নামে রেজিস্ট্রেশনপ্রাপ্ত হয়। বিদ্যালয়ের উত্তর পার্শ্বের জমি খরিদ করিয়া নতুন করিয়া আরও একটি প্রায় ২.৪০ একর ভূমির উপরে খেলার মাঠ তৈরী করা হয় এবং পূর্বের খেলার মাঠটি কৃষিকার্যে ব্যবহার করিয়া বিদ্যালয়ের আয়ের উৎস বাড়ানো হয়। বর্তমানে খেলার মাঠে বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীরা তথা গ্রামবাসী খেলাধুলা করে এবং প্রতিবৎসর বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়।

তাহার পর সরকারী অনুদানে দুইটি পাকা দালান তৈরী হইতে শুরু হয়। দালান দুইটির নির্মাণকার্য অসমাপ্ত অবস্থাতেই দেশে স্বাধীনতা সংগ্রাম শুরু হয়।

দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রাম চলাকালীন সময় বিদ্যালয়ের সমস্তকার্য বন্ধ হইয়া যায়। পাকহানাদার বাহিনী এই বিদ্যালয়েও হামলা চালায়। লাইব্রেরী কক্ষের দরজা ভাঙ্গিয়া অনেক বই-পুস্তক, পুরাতন তথ্য সম্বলিত কাগজপত্র পোড়াইয়া ফেলে এবং আসবাবপত্র ভাংচুর করে। স্বাধীনতা অর্জিত হইবার পর অত্র অঞ্চলের বিদ্যানুরাগী ব্যক্তিগণ, বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটি এবং শিক্ষক মণ্ডলী অতিকষ্টে নিরলস প্রচেষ্টা চালাইয়া এবং পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলাদেশ সরকারের সীমিত অনুদানের দ্বারা গৃহগুলি সংস্কার এবং আসবাবপত্র পুনঃনির্মাণ করিয়া বিদ্যালয়টি চালু করেন। বর্তমান সরকারের অনুদানে তিন কক্ষ বিশিষ্ট একটি গৃহ ফ্যাসালিটি বিভাগের দায়িত্বে তৈরি হইয়াছে। অনেক বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতি বিদ্যালয়ে রহিয়াছে, শুধু একটি পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞানাগার নাই।

বর্তমানে সং কমিটি পূববর্তী ধারা অনুসরণ করিয়া কমিটি এবং শিক্ষকগণ সম্পৃক্ত হইয়া বিদ্যালয়ের পুরাতন তিনটি দালান মেরামত করিয়া একটি ভবনে রূপান্তর করিয়াছেন এবং টিনের ঘরগুলি স্থানান্তর ও সংস্কার করিয়া পরিবেশ রক্ষার জন্য অনেক সুদৃশ্য বৃক্ষ রোপন করিয়াছেন ও তিনটি স্যানিটেরিয়াম ল্যাট্রিন নির্মাণ করিয়াছেন তাহা ছাড়া লেখাপড়ার মান অনেক উন্নত হওয়ায় বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইয়াছে। বিদ্যালয়ের বর্তমানে প্রবীন, নবিন শিক্ষক সংখ্যা দশজন। এই শিক্ষক গণ সবাই স্থানীয়। শিক্ষক সংখ্যা বৃদ্ধি পূর্বক বিদ্যালয়টি বহুমুখী করার প্রচেষ্টা চলিতেছে। একজন নবীন এম. এস-সি, বি-এড এবং অন্যান্য শিক্ষায় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত শিক্ষককে সহকারী প্রধান শিক্ষকের পদে বহাল করিয়া বিদ্যালয়টির আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছেন।

অত্র বিদ্যালয়টিতে জন্মলগ্ন হইতেই কো-এডুকেশন চালু থাকায় বর্তমানে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা প্রায় সমান সমান পর্যায়ে দাঁড়াইয়াছে। তাহাছাড়া বিদ্যালয়ের বর্তমান কার্যকরী পরিষদ তাহাদের সততা, ন্যায়নিষ্ঠা এবং ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও গ্রাম বাসীদের সহযোগীতায় বিদ্যালয়টির যে প্রভূত উন্নতি সাধন করিয়াছেন যাহা ভবিষ্যত প্রজন্ম অক্ষুণ্ন রাখিলে বিদ্যালয়টি শুধুমাত্র রাজশাহী বিভাগে নহে সারা বাংলাদেশের একটি দৃষ্টান্তমূলক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসাবে চিহ্নিত হইতে পারে। ইহা নিঃসন্দেহে অত্র এলাকার লোকের মধ্যে বিদ্যানুরাগের প্রতিফলন।

যদিও এই সংক্ষিপ্ত কলেবরে সমস্ত বিষয় পূর্ণাঙ্গভাবে উল্লেখ করা সম্ভব নয় তথাপীও একজন ব্যক্তির নাম উল্লেখ না করিলে বর্তমান প্রজন্ম উক্ত ব্যক্তির নিকট অকৃতজ্ঞ থাকিবে। তিনি হইলেন পোতাজিয়া ইউনিয়নের ইসলাম ধর্মাবলম্বী ব্যক্তিগনের মধ্যে প্রথম এন্ট্রান্স পাশ। তিনি শিক্ষা জীবন শেষ হইতে না হইতেই অত্র বিদ্যালয়ে শিক্ষকতা শুরু করেন এবং পাশাপাশি বিদ্যালয়ের করণিকের কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে থাকেন। তিনি ছিলেন একজন অত্যন্ত দক্ষ ইংরেজী শিক্ষক এবং বিশিষ্ট সমাজকর্মী। তাঁহার সারাটা জীবন এই বিদ্যালয়ের সেবায় নিয়োজিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যে ও ব্যক্তিত্বের কারণে শুধু অত্র পোতাজিয়া ইউনিয়নবাসী নহে অত্র এলাকাবাসী তাঁহাকে মাস্টার সাহেব খ্যাতিতে অভিহিত করেন। বর্তমানেও শ্রদ্ধার নিদর্শন সরূপ তাহার বিদ্যালয়ের কর্মজীবনে যে চেয়ারটিতে বসিয়া কাজ করিতেন সেই চেয়ারটিতে কেহই বসেন না এবং তাহা যত্ন সহকারে বিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ সংরক্ষিত করিয়া রাখিয়াছেন।

বিদ্যালয়টির এই বৎসর শতবর্ষ পূর্তি উৎসব বিশেষ মর্যাদার সহিত পালিত হইতেছে এবং বিদ্যালয়টির অতীত ও বর্তমানের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস শতবর্ষপূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত মার্গণ এ সন্নিবেশিত করা হইল, যাহাতে পাঠকবর্গ এবং আগামী প্রজন্মের কাছে এই বিদ্যালয়টির সমীক্ষা সহজতর হয় এবং পরবর্তী প্রজন্ম এই সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার সার্থক দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করিয়া পোতাজিয়া তথা অত্র এলাকায় শিক্ষা বিস্তারের অধিকতর সুযোগ সৃষ্টিতে অনুপ্রাণিত হয়।

এখানে স্মরণযোগ্য যে, আমাদের আত্মতুষ্টির অবকাশ নাই আরও অনেক কিছু করিবার রহিয়াছে যদিও যাতায়াত ব্যবস্থা পূর্বের তুলনায় কিছু অংশে সুবিধাজনক হইয়াছে ভবিষ্যতে শিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন প্রয়োজন অনুযায়ী হইবে, এই প্রত্যাশা রাখিয়াই প্রবন্ধটির সমাপ্তি টানা হইল।